দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৫ ও ৩৬ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮, ২০১৯

আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম

আলমগীর হোসেন খান*

সারসংক্ষেপ

আত্মার স্বরূপ নিয়ে দর্শনের ইতিহাসে রয়েছে বিস্তর মত-পার্থক্য। কেউ একে আধ্যাত্মিক ও অজড়ীয় সত্তা আবার কেউ একে জড়ীয় সত্তা হিসেবে দেখেছেন। যারা আত্মাকে আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে দেখেছেন তাদের মধ্যে ভারতীয় দার্শনিকগণ আত্মাবাদী এবং পাশ্চাত্য ও মুসলিম দার্শনিকগণ ভাববাদী নামে পরিচিত। এই ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও আত্মা সম্পর্কিত তাদের দর্শনের সাথে ধর্মদর্শনের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। প্রচলিত অধিকাংশ ধর্ম আত্মাকে দেখে অজড়, অক্ষয়, অমর হিসেবে। কাজী নজরুল ইসলাম বহু-জাতিক ভারতীয় মিশ্র সমাজে বসবাস করার সুবাদে সনাতন, ইসলাম, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্ট প্রভৃতি ধর্ম এবং দার্শনিকগণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সঙ্গতকারণেই তাঁর মধ্যে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কিত ধর্মীয় ও ভাববাদী ব্যাখ্যা প্রাধ্যান্য পায়। তবে ভারতীয় অনাত্মাবাদী ও পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। আর সচেতনভাবেই তিনি বস্তুবাদী দর্শনের পরিবর্তে ভাববাদী দর্শনকে বেছে নেন। ভাববাদী দার্শনিকদের মতো তিনিও আত্মাকে দেখেন অজড়, অক্ষয়, অব্যয়, অমর হিসেবে। অন্যান্য দার্শনিকদের মতো তিনিও আত্মার সমার্থক শব্দ হিসেবে 'আমি'কে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, 'আমি'ই আমার আত্মা। এই আত্মার ক্ষমতা অসীম। যে তার আত্মাকে চিনতে পারে তার কাছে কোনো কিছুই অসাধ্য থাকে না। এজন্য 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু' কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ, অভিভাষণ, নাটক, উপন্যাস তথা সমগ্র সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে তিনি 'আমি'র জয়গান করেছেন। আত্মার সমার্থক হিসেবে তিনি আবার যুগপৎভাবে ঈশ্বর ও ব্যক্তি মানুষকেও বুঝিয়েছেন। সুফি দার্শনিকদের মতো নজরুলও মনে করেন এই ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান। অর্থাৎ মানবাত্মার মধ্যে বিশ্বাত্মার অবস্থান। বিশ্বাত্মা, মানবাত্মার মধ্যে অবস্থান করলেও মানবাত্মার মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাত্মার সাথে মিলন বা মোক্ষলাভ।

* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর

ভূমিকা

ধর্ম ও নৈতিকতা যা ছাড়া অর্থহীন, সেই আত্মা, দর্শনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আত্মা সম্পর্কে আলোচনা মানব ইতিহাসের সূচনা থেকেই লক্ষ করা যায়। এমনকি বলা হয় যে আত্মার অমরতার ধারণা ঈশ্বরে বিশ্বাসের ধারণার চেয়েও প্রাচীন। কারণ পৃথিবীতে এমন অনেক উপজাতি রয়েছে যাদের ঈশ্বর বিষয়ে কোনো ধারণা নেই, কিন্তু এমন কোনো উপজাতি নেই যেখানে পরলোক ও অমরত্বের ধারণা নেই। মানুষ যখন প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা পায় তখনই তার মনে প্রশ্ন দেখা দেয় এর স্বরূপ নিয়ে। দেহাবসানের সাথে আত্মার অবস্থান কেমন হয় তা প্রত্যেক মানুষের চিন্তার অন্যতম একটি উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয়। কেননা দেহের মৃত্যুর সাথে যদি আত্মার মৃত্যু ঘটে তাহলে এই পার্থিব ক্রিয়াকর্মের প্রতিফল মানুষ কিভাবে ভোগ করবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ধর্মের আবির্ভাব ঘটলে ধর্মগ্রন্থে এই সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। ধর্মের ব্যাখ্যায় অনেকে সন্তুষ্ট হলেও অনেকে এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। এর মধ্য দিয়েই আত্মার স্বরূপ বিষয়ক দার্শনিক আলোচনার শুরু হয়।

যে সকল দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ও মনীষী আত্মার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) অন্যতম। তিনি তাঁর সাহিত্যভাণ্ডারের মধ্য দিয়ে আত্মাকে অঙ্কিত করেছেন একটি আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে। আধ্যাত্মিক সত্তা হওয়ায় সঙ্গতকারণেই এটি অজড়ীয়; এর কোনো ক্ষয় নেই, এটি অমর। তাঁর মতে জড়দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু একে আশ্রয় করে থাকা আত্মার কোনো বিনাশ নেই; বরং দেহবিনাশের মাধ্যমে মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। এভাবে নজরুল গড়ে তোলেন আত্মা সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো আত্মার স্বরূপ সম্পর্কীয় দার্শনিক আলোচনায় নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করা।

ধর্ম ও দর্শনে আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি

আত্মা বিষয়ক আলোচনা প্রথম লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে। *গীতার* শুরু হয়েছে আত্মাতত্ত্বের আলোচনার মধ্য দিয়ে। *গীতায়* আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের যুক্তি খণ্ডন করে পার্থিব দেহের নশ্বরতা আর আত্মার অবিনাশিতা বা অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[১] এ মতে 'আত্মা' হলো চিৎকণা, যা মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* অশরীরী দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। সে আত্মার সুখ-দুঃখের বোধ নেই, শরীরেই দুঃখ, অশরীরীত্বেই শাশ্বত আনন্দ।[২] *কঠোপনিষদে* আত্মাকে 'আমি'র সমার্থক মনে করা হয়। আর সে 'আমি' বা আত্মা দেহাতীত।[৩] *বেদ*, *উপনিষদ*, *গীতা*, *ব্রহ্মসূত্র* প্রভৃতি গ্রন্থের পাশাপাশি হিন্দু ষড়দর্শনেও আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করা

হয়েছে। এসব দর্শনে আত্মাকে 'ব্রহ্ম,' 'জীব,' 'পুরুষ,' 'বুদ্ধি,' 'প্রাণ' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর সংস্কৃত অভিধান রচয়িতাগণ আত্মাকে এগারোটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে আত্মার সমার্থক শব্দগুলোর মধ্যে *ঋগ্বেদে* আত্মা সাতটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে আত্মার সমার্থক শব্দ হিসেবে বায়ু, শ্বাস, স্বয়ং, দেহ, নিয়ন্তা, সত্তা, ব্রহ্ম প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।[৪] *ঋগ্বেদে* আত্মার সমার্থক শব্দ হিসেবে শুধু 'ব্রহ্ম' শব্দটিই দুইশতবার ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শনকে *আত্মাবাদী* এবং *অনাত্মাবাদী* এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, এবং বেদান্ত দার্শনিকেরা আত্মাবাদী। অন্যদিকে চার্বাক, জৈন, ও বৌদ্ধ দার্শনিকেরা অনাত্মাবাদী। আত্মাবাদী দার্শনিগণ মনে করেন আত্মা দেহের অতীত, অজড় এবং অবিনশ্বর। আত্মা দেহকে আশ্রয় করে থাকলেও দেহের কাজ আত্মার নির্দেশ মান্য করা। এ মতানুসারে আত্মা যেহেতু অবিনাশী, অমর, সেহেতু আত্মা কখনও মানুষের মনের চিন্তাধারা, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, ইচ্ছা-দ্বেষ-সংঘাতের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। এ জন্য আমরণ ব্যক্তির মধ্যে 'আমি শিশু', 'আমি বালক', 'আমি যুবক', 'আমি তরুণ', 'আমি বৃদ্ধ' প্রভৃতি 'আমিত্ব বোধক' ক্রিয়া সর্বত্র বিদ্যমান থাকে। যোগদর্শনে মনে করা হয় আত্মা নিত্য, অপরিণামী, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং স্বরূপত মুক্ত ও অসঙ্গত হলেও অবিদ্যার কারণে অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান, অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান, দুঃখজনক বস্তুকে সুখকর এবং অশুচিকে শুচিজ্ঞান করে থাকে।[৬] আর অনাত্মাবাদী দার্শনিকেরা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করেন আত্মা জড়ের উপজাত হিসেবে অস্তিত্বশীল। জড়ের বিনাশের সাথে সাথে আত্মাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ভারতীয় দর্শনের ন্যায় পাশ্চাত্য দর্শনেও আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে দার্শনিকগণ দু'টি প্রধান দলে বিভক্ত। ভাববাদী দার্শনিকগণ জড়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রাচীন পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটোর মতে, মৃত্যু মানে মিশ্র পদার্থের অন্তর্গত উপকরণাদির বিচ্ছেদ। আত্মা অমিশ্র, সরল ও অবিচ্ছেদ্য হওয়ায় মৃত্যু আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং তার বিনাশ নাই। ইমানুয়েল কান্ট আত্মাকে একটি অজড়ীয় আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে দেখেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে রেঁনে ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ, লুইস, সুইনবার্নে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন আত্মা ও দেহ স্বতন্ত্র দু'টি সত্তা। দেহ যেখানে জড়ীয় স্বভাবের, আত্মা সেখানে আধ্যাত্মিক স্বভাবের। এভাবে তাঁরা দেহ-মন সম্পর্কিত *দ্বৈতবাদ* (dualism) প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে বস্তুবাদী দার্শনিকগণ আত্মাকে জড়ীয় স্বভাবের বলে অভিহিত করেন। পরমাণুবাদী ও বিবর্তনবাদী দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ এ মতবাদের বলিষ্ঠ প্রচারক। তাঁদের মতে আত্মা জড়ের

উপজাত। যাহোক, ভাববাদী ও বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে দেহ-মনের স্বরূপ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে মন বা আত্মা কথাটি 'আমি'-র প্রতিশব্দ হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

হিন্দুধর্ম ও দর্শন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের পাশাপাশি ইসলাম ও মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তাতেও আত্মা বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আত্মার সমার্থক শব্দ হিসেবে 'রুহ,' 'নফস,' 'কলব' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৭] আল-কোরআনে আত্মাকে আল্লাহর আদেশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে এও বলা হয়েছে যে, মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ জানা সম্ভব নয়, কেননা মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।[৮] কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ মানুষকে পচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। এ অবস্থায় মানবদেহ ছিলো জড়ীয় সত্তা; যার কোনো চেতনা ছিলো না। অতঃপর আল্লাহ তার মধ্যে রূহ বা আত্মা প্রবেশ করিয়ে দেন।[৯] ফলে সে মাটির দেহ আত্মাপ্রাপ্ত হয়ে চেতনসত্তায় রূপান্তরিত হয়। রূহ বা আত্মা যেহেতু আল্লাহর আদেশস্বরূপ সেহেতু বলা যায় যে, আত্মা জড়ীয় স্বভাবের নয়; বরং, আধ্যাত্মিক স্বভাবের।

মুসলিম দার্শনিক আল-কিন্দির দর্শনে কুরআনের ভাষ্যের প্রতিফলন রয়েছে। তিনি আত্মাকে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে দেখেছেন। তিনি মনে করেন আত্মা ও জড় স্বতন্ত্র দু'টি সত্তা। মানবাত্মা একটি বিশুদ্ধ, অবিনাশী ও অশরীরী দ্রব্য। এর আদি নিবাস প্রত্যয় জগতে। মৃত্যুতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মা অনন্ত প্রত্যয়ের জগতে চলে যায়।[১০] আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত হলে দেহে আর কিছু থাকে না। আত্মা ব্যতীত দেহ হয়ে যায় জড়। সুতরাং মৃতদেহের কোনো মূল্য থাকে না। আত্মা দেহে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মানুষ তাকে দাম দেয়, শ্রদ্ধা করে। সুতরাং জড়ের কাজ হলো আত্মার নির্দেশ মান্য করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আত্মার স্বরূপ নিয়ে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ দু'টি ধারায় বিভক্ত। যার একটি ধারা আত্মাকে অজড়ীয় বা আধ্যাত্মিক সত্তা এবং অন্য দলটি আত্মাকে জড়ীয় স্বভাবের মনে করে থাকেন। মুসলিম দার্শনিকগণ ভারতীয় আত্মাবাদ এবং পাশ্চাত্য ভাববাদী ব্যাখ্যার সমার্থক। তবে সকল দর্শনে আত্মাকে 'আমি' এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যা আমি, তাই আত্মা।

আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে নজরুল

নজরুল যে সমাজে বসবাস করতেন সে সমাজের হিন্দু-মুসলিম ছিল একে অপরের বিরোধী। এই দু'টি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যকার ব্যবধানের মূল কারণ হিসেবে নজরুল

ধর্মান্ধতাকে দায়ী করেন। আর এই ধর্মান্ধতা দূর করে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করতে ধর্মের প্রকৃত বিধান উপস্থাপনকে তিনি জরুরি মনে করেন। সে লক্ষ্যে নজরুলকে সনাতন ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে প্রচুর অধ্যয়ন করতে হয়। ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সুবাদে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে শঙ্কর, রামানুজ; উর্দু, ফারসি, ও আরবি ভাষা জানার সুবাদে আল ফারাবি, ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রমুখ মুসলিম দার্শনিকদের দর্শন সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হন। তাছাড়া পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটো, হেগেল, কার্ল মার্কস, রাসেল, বার্কলি প্রমুখ দার্শনিকদের দর্শন সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় নজরুলের 'পরিকল্পিত পাঠ্যতালিকা'[১১] থেকে। উপর্যুক্ত দার্শনিকদের দর্শন অধ্যয়ন থেকে নজরুল জানতে পারেন, আত্মা সম্পর্কে তাঁদের মত হলো আমার 'আমি'ই আমার আত্মা। অর্থাৎ আমি আর আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শঙ্কর মনে করেন, 'আমি' বা আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ই তত্ত্ব-জ্ঞান। তিনি আরো বলেন- আত্মার স্বরূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে যতোই মতভেদ থাকুক না কেন, আত্মা বা 'আমি'র প্রতীতি কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

নজরুলের দর্শনের মূল কথাই হলো 'আমি'র আমিত্ব। নজরুল মনে করতেন আত্মা সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত চিরস্বাধীন সত্তা; তার কোনো বিনাশ নাই, সে অক্ষয়, অব্যয়। আত্মার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন– "আমি অজড়, অমর, অক্ষয়, আমি অব্যয়!" তিনি আত্মাকে আবার দেখেন চেতনসত্তা হিসেবে। যেমন তিনি বলেন– "আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন।" এই 'আমি' বিশ্বের সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে এই 'আমি'। নজরুলের এই আমিত্বের প্রচার 'বিদ্রোহী,' 'ধূমকেতু' কবিতাসহ অসংখ্য কবিতায় ফুটে উঠেছে। আত্মাকে এখানে নজরুল দুইভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো খণ্ড আত্মা বা একক আত্মা এবং অন্যটি হলো অখণ্ড আত্মা বা সামষ্টিক আত্মা। আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে নজরুলের মত হলো ব্যক্তির স্বতন্ত্র যে সত্তা, সে সত্তার ক্ষমতাকে দুর্বল মনে হলেও অখণ্ড আত্মা চিরমুক্ত, অবিনাশী এবং অক্ষয়। ফলে এই অখণ্ড আমি'কে কোনো শক্তিই পরাজিত করতে পারে না। এখানে নজরুল আত্মাকে ব্যক্তি মানুষের সাথে তুলনা করেছেন। আত্মাই ব্যক্তি; আত্মা ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনাতীত। তিনি মনে করেন এই আত্মা ব্যক্তিভেদে আলাদা। ফলে তা সংখ্যায় অসংখ্য। তবে আত্মা অসংখ্য হয়েও এক হয়ে যেতে পারে যদি তাদের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হয়। আত্মা চিরমুক্ত; তাকে বাহুবন্ধনে বাঁধার শক্তি কারো নেই। নজরুল বলেন-

ঐ নির্যাতকের বন্দি-কারায়
সত্য কি কভু শক্তি হারায়

ক্ষীণ দুর্বল বলে খণ্ড 'আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওরে অখণ্ড আমি চির-মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয়![১২]

নজরুল মনে করেন আত্মার ক্ষমতা অসীম। এজন্য ব্যক্তি যদি একবার তার আত্মাকে চিনতে পারে তার কোনো কিছু অসাধ্য থাকে না। কেননা আত্মাকে চেনা মানে হলো নিজেকে চেনা। নজরুল বলেন– "তুই আত্মাকে চিন, বল 'আমি আছি', 'সত্য আমার জয়![১৩] তিনি আরো বলেন– "আমার বিশ্বাস, যে নিজেকে চেনে, তার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না।"[১৪] সুতরাং যে নিজেকে চিনতে পারে সে তার পরম 'সুন্দর'কে চিনতে পারে। পরম সুন্দর দ্বারা নজরুল ঈশ্বরকে বুঝিয়েছেন। নজরুল আরো মনে করেন মানুষ নিজেকে বা নিজের আত্মাকে যখন সম্মান দিতে শিখবে সেদিনই কেবল অন্যরা তাকে সম্মান দিবে। নজরুল বলেন–

> আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যি আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়। নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তা হলে এই তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না। আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে নিজের ভগবান মনে করার দম্ভ–আর যাই হোক ভণ্ডামি নয়।[১৫]

নজরুলের পূর্ববর্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যেও এই চিন্তা লক্ষণীয়। লালন ফকির বলেছিলেন 'আপনারে চিনতে পারলে যাবে অচেনারে চেনা'। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেঁনে ডেকার্টও এই আত্মাকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল।" সুতরাং বলা যায়, আত্মার অস্তিত্বশীলতার অর্থ হলো মানুষের অস্তিত্বশীলতা। কেননা আত্মা যতক্ষণ দেহকে আশ্রয় করে আছে ততক্ষণ দেহ সচল; আত্মার অবসানেই দেহ নিশ্চল হয়ে পড়ে। আল্লামা ইকবাল মনে করতেন অহং বা আত্মসত্তাই ব্যক্তির গোটা সত্তার কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ। ব্যক্তিমানুষ ও সামাজিক মানুষের পুনর্জাগরণ ও যথার্থ বিকাশ কেবল অহং বা আত্মসত্তার বিকাশের মাধ্যমে সম্ভব। এই 'আপনাকে' চেনার প্রচেষ্টা নজরুলের মধ্যে দেখা যায়। তিনি সহসা নিজেকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন– "আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।"[১৬] তিনি বুঝতে পারেন স্বয়ং জগদীশ্বর তাঁর মধ্যে বিরাজমান। ফলে ঈশ্বরের শক্তিও তাঁর মধ্যে প্রবহমান। আর এ জন্যই তিনি জগদ্বীশ্বরের সাথে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারেন।

নিজের আত্মাকে চিনতে পারা এবং নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯৪১ সালের ১৬ মার্চ বনগাঁ সাহিত্যসভার চতুর্থ বার্ষিকী সম্মেলনে প্রদত্ত নজরুলের সভাপতির ভাষণে। সে ভাষণে নজরুল বলেন যে, জন্মক্ষণ থেকে তিনি তাঁর অস্তিত্বকে খুঁজে ফিরছিলেন। অবশেষে তাঁর উপলব্ধি হয় যে, নিত্য পরমানন্দময়ী পরম প্রেমময়ী পরমা শ্রীরূপে ঈশ্বরই তাঁর বাহ্যিক অস্তিত্ব। সে অর্থে ঈশ্বরই তাঁর আত্মা। এই আত্মা নজরুলের সাহিত্যে পরম সুন্দর, সখা, বন্ধু, খোদা, ভগবান, আল্লাহ, প্রেম, জগদ্বীশ্বর প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর সর্বাস্তিত্ব জুড়ে রয়েছে পরম সুন্দর তথা প্রেমের প্রতিরূপ আত্মার উপস্থিতি। তাই যতক্ষণ তিনি পরম সুন্দরের সান্নিধ্যে থাকেন ততক্ষণ তাঁর কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে প্রাণ থাকে। কিন্তু যখনই পরম সুন্দরের সাথে তাঁর বিয়োগ ঘটে তখন সবকিছু হয়ে যায় শুষ্ক পল্লবের ন্যায়। নজরুল বলেন–

> আজ আমার মনে হয়, এই নিত্য পরমানন্দময়ী পরম প্রেমময়ী পরমা শ্রীই আমার অস্তিত্ব–আমার শক্তি। নিরাকার নির্গুণ আবাঙমানসগোচর ব্রহ্মা যেমন তাঁর শক্তির আশ্রয় ভিক্ষা করেন সৃষ্টির রূপে, গুণে প্রতিভাত হন বা মনের গোচর হন, এই প্রেম-শক্তির আশ্রয় পেয়ে আমিও তেমনি আবার সৃষ্টিতে যেন ফিরে আসছি। এই প্রেমই যেন আমার অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব, এই প্রেমকে খুঁজে পচ্ছিলাম না বলেই যেন আমি অভিমানে সংহারের পথ চলেছিলাম। এই পরম-নিত্য প্রেম শক্তিকে পেয়েই আমি পরম নিত্যম–আমার বাহ্যিক অস্তিত্বকে পেলাম।... আমার এই পরম মধুময় অস্তিত্বে প্রেম-শক্তিতে আত্মসমর্পণ করে আমি বেঁচে গেছি, আমার অনন্ত জীবনকে ফিরে পেয়েছি।... আমি আমার অস্তিত্বকে, আমার শক্তিকে খুঁজতে এসেছিলাম পৃথিবীতে তাঁর দেখা পেয়েছি–তাঁর পরম-সুন্দর নয়নের পরম প্রসাদ পেয়েছি।[১৭]

নজরুলের এ চিন্তা ধর্ম দ্বারাও সমর্থিত। ইসলামধর্মে মানুষকে অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনাময় আল্লাহর পার্থিব প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ 'আমি ক্ষুদ্র', 'আমি দীন', 'আমি শক্তিহীন' বলে ভাবতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সে তার পরম প্রভুর সান্নিধ্য পায় তখন সে বুঝতে পারে সে আর দেহবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব নয়। সে ঈশ্বরেরই স্বরূপ এবং তারই অনুপ্রকাশ। নজরুল নিজের মধ্যে ঈশ্বরের সে অনুপ্রকাশ উপলব্ধি করেন। 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে নজরুল এ সম্পর্কে বলেন– "এ লেখা আমার নয়, এ লেখা আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা-বিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।"[১৮] ক্ষুদ্রাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের ফলে শক্তির যে স্ফূরণ ঘটে তাতে মানুষের সমস্ত দীনতা ঘুচে যায়। এ জন্যই হয়তো নজরুল নিজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে বলে উঠেন– "আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!" নজরুল মনে করেন নিজেকে চিনতে পারলেই নিজের মধ্যকার অসীমতাকে চেনা যায়। ফলে জগতের সকল কিছু তার করতলে চলে আসে। তিনি বলেন– "জাগো অচেতন,

জাগো! আত্মাকে চেনো! যে মিথ্যুক তোমার পথে এসে দাঁড়ায়, পিষে দিয়ে যাও তাকে, দেখবে তোমারই পতাকা-তলে বিশ্ব-শির লোটাচ্ছে। তোমারি আদর্শে জগৎ অধীনতার বাঁধন কেটে উদার আকাশতলে এক পঙ্‌ক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।"[১৯] আত্মা তথা নিজেকে জানলে সবকিছুকে জানা যায় বলেই হয়তো সক্রেটিসের মূলমন্ত্র ছিলো 'নিজেকে জানো'।

'উন্নত মম শির' নজরুলের আত্মদর্শনের মূল বাণী। নিজ শির উঁচু করে দাঁড়ানো অর্থ পৃথিবীর সকল অন্যায়, অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ঘোষণা আমি তোমার অন্যায় আদেশ পালনে বাধ্য নই, আমি আমার আত্মার অপমান করব না, জান দিবো, তবু মান দিবো না। তাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হওয়ার আহ্বান করে নজরুল বলেন– "এই কথা বলে বেরিয়ে এস–আমি আছি, আমাতে আমিত্ব আছে, আমি পশু নই, আমি মনুষ্য, আমি পুরুষসিংহ।"[২০] তাই নজরুল গবেষক নজরুল ইসলাম দেখান নজরুলের 'আমি' হচ্ছে হুইটম্যানের আমি; এই আমিতে একমাত্র নজরুলকে না বুঝে প্রত্যেক মানুষকে বুঝতে হবে। কারণ নজরুলের 'বিদ্রোহী' হলো ব্যক্তির উপনিষদ, আর ব্যক্তিত্ব হলো এই কবিতার বেদান্ত। বেদান্ত দর্শন অনুসারে নিত্যমুক্ত আসল 'আমি' বা সত্যিকার মনকে জানতে পারলে তবেই মুক্তি। তাই জগতের দার্শনিক চিন্তায় মনে করা হয় যে 'আত্ম-জ্ঞানে মুক্তি'। সমাজের যাবতীয় অন্যায়, শোষণ হতে মুক্তি পেতে হুসার্ল, জেমস এবং সার্ত্রের মতো নজরুলও মনে করেন মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মশক্তি আনয়নের চেষ্টা করতে হবে। একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের জন্য প্রথম প্রয়োজন আত্মচেতনা ও আত্মশক্তি।[২১] নজরুল 'আত্মশক্তি' কবিতায় বলেন–

> জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে রাজিছে রুদ্র তেজ রবির!
> উদয়-তোড়ণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন 'আমি-আছি'র![২২]

নজরুলের উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তির 'আত্ম-চেতন' ও 'আমি-আছি' ডেকার্টের "আমি সচেতন, সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল" এর অনুরূপ অর্থ বহন করে। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী মানুষকে নজরুল মহাপাপী বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে উন্নয়নের পথে, স্বাধীনতার পথে নিয়ে যায়। আত্মচেতনা প্রবল হলেই ব্যক্তির মধ্যে মনুষ্যত্বের স্বাধীন সত্তা জেগে ওঠে এবং মনুষ্যত্বের সত্তা জাগলেই মানুষ অপরের আধিপত্য থেকে শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারে। তখনই সে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে। তাই পুরুষ বলতে নজরুল 'আত্মশক্তি'কেই বুঝিয়েছেন। আবার এই আত্মশক্তিরই আরেক নাম আত্মা।

আত্মার অমরতা প্রসঙ্গে নজরুল

আস্তিক্যবাদী ধর্মে আত্মার অমরতায় বিশ্বাস ঈশ্বর বিশ্বাসের মতোই অপরিহার্য। কেননা আত্মা অমর না হলে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্ম আত্মার অমরতা ও পুনর্জন্ম বা পুনরুত্থানের কথা স্বীকার করেছে। ইসলাম মতে আল্লাহ নির্দিষ্ট একটি সময়ে আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। তবে আত্মা সৃষ্ট হলেও তা কখনওই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। এটি চিরস্থায়ী বা অমর। এ মতে দেহের মৃত্যুর ফলে আত্মা মৃত হয় না বরং এটি কেবল পার্থিব জীবন থেকে অপার্থিব জীবনে স্থানান্তরিত হয়। মৃত্যুর পর আত্মাকে তার কর্ম অনুযায়ী 'ইল্লিন' অথবা 'সিজ্জিন' নামক স্থানে রাখা হয়। অতঃপর শেষ বিচারের দিন তাদেরকে হয় জান্নাত, নয়তো জাহান্নামে প্রেরণ করা হয়। এ ধর্মানুসারে সৎকর্মেই মুক্তি। সংকর্মের ফলেই আল্লাহর সাথে সান্নিধ্যের সুযোগ লাভ সম্ভব। আল্লাহর সাথে সান্নিধ্য লাভই মানুষের চরম লক্ষ্য।

হিন্দুধর্ম মতেও মানুষের চরম লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষলাভ করা। মোক্ষলাভ হচ্ছে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, আসক্তি, মোহ, লোভ ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিলাভ করে ব্রহ্মের সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া। এ লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে আত্মাকে অবশ্যই অমর হওয়া বাঞ্ছনীয়। *উপনিষদ* ও *বেদ*-এ বলা হয়েছে পরমেশ্বর যেমন শাশ্বত, জীবাত্মাও তেমন শাশ্বত। কারো অস্তিত্ব বিনাশশীল নয়। দেহ যখন আত্মার বসবাসের অযোগ্য হয়ে যায় তখন আত্মা অন্যদেহে প্রবেশ করে।[২৩] *গীতায়* বলা হয়েছে "আত্মা কখনও জন্মে না বা মরে না। জাত বস্তুর ন্যায় আত্মা জন্মে অস্তিত্বলাভ করে না। অর্থাৎ আত্মা স্বরূপে নিত্য ও বর্তমান। আত্মা জন্মরহিত, শাশ্বত এবং পুরোনো। শরীরের বিনাশ ঘটলেও আত্মার বিনাশ নেই।"[২৪] *গীতার* অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে আত্মীয়-হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধত্যাগের সংকল্প করছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আত্মা দেহাতীত, অজড়, অমর।[২৫] আত্মার অবিনাশিতা সম্পর্কিত ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মতের প্রতিফলন রয়েছে নজরুলের সাহিত্যে। তিনি বলেন– "আত্মা অবিনশ্বর আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারে না।"[২৬] নজরুল মনে করেন মৃত্যুতে আত্মার স্থানান্তর ঘটে মাত্র। দেহ বিনাশের সাথে যে আত্মা বিনাশপ্রাপ্ত না হয়ে অমর থাকে তার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু প্রসঙ্গকে সামনে নিয়ে আসেন। নজরুল বলেন–

> দেহ শুধু তার গিয়াছে, যায়নি তার স্নেহ ভালোবাসা,
> যখনি পড়িবে ভাষা তার, প্রাণে জাগিবে বিপুল আশা।[২৭]

আত্মার অমরতা ও অবিনশ্বরতার এ দিকটি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নাকি ঈশ্বর বিশ্বাসের মতোই বিনাবিচারে বিশ্বাস করতে হবে, এমন প্রশ্নের সমাধান রয়েছে ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের দর্শনে। জন লক আত্মার অমরত্বের ব্যাপারে মনে করেন, আত্মার অমরতা বিষয়ে মানুষের অনুভূতিমূলক কিংবা প্রমাণমূলক জ্ঞান নাই, তবুও তা বিশ্বাসের উপর গ্রহণ করতে হবে। তাঁর মতে অভিন্নতা ও ব্যক্তিত্বের ধারণা থেকে অমরত্বের অনুমান করা যায় না। অমরত্ব মানুষকে দেওয়া ঈশ্বরের একটি উপহারস্বরূপ।[২৮] রুশো মনে করেন চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার কল্যাণেই মানুষ ইতরপ্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। তা-ই মানুষকে আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রতীতি দিয়ে থাকে। আর কান্ট মনে করেন এ পৃথিবীতে অসৎ লোকেরা প্রায়শই বিজয়ী ও সুখী এবং সৎ লোকেরা অনেক সময় নির্যাতিত ও অসুখী হয়ে থাকে। এ থেকে নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে দেহবিনাশের পর আত্মা টিকে থাকবে। এক সময়ের আস্তিক ও পরবর্তীতে সংশয়বাদী বন্ধু ভলতেয়ারকে লিখিত চিঠিতে কান্ট বলেন–

> এ জীবনে আমি এতো বেশি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছি যে, পরলোক প্রত্যাশা না করে পারি না। অধিবিদ্যার কোনো কূটযুক্তি অমরত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার মনে এতটুকু সংশয় সৃষ্টি করতে পারবে না। এ আমি জানি, এ আমি বিশ্বাস করি, এ আমি প্রত্যাশা করি এবং জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি এ বিশ্বাসে অটল থাকব।[২৯]

কান্টের মতো নজরুলও মনে করেন বিশ্বে কোনো কিছুই নশ্বর নয়; সবকিছু অবিনশ্বর। তা যে লোকেই হোক আর যে আকারেই হোক বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সৃষ্টিকুলের সদস্য হিসেবে মানুষের আত্মার কোনো ক্ষয় নেই, বরং সে অমর, অক্ষয়। চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির অনুষ্ঠানে মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেবের কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বলেন– "আমি জানি, এ বিশ্বে কোনো কিছুই নশ্বর নয়, কোনো কিছুই হারায় না কোনোদিন। যে-রূপেই যে-লোকেই হোক তিনি আছেন এবং আমার এই ভাসিয়ে দেওয়া সালামি-ফুলও সেই না জানার অকূলে কূল পাবেই পাবে।"[৩০] অন্যত্র ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাণী "তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু"। নজরুল আরো বলেন–

> ঝরে যে ফুল ধূলায়, জানি, হয় না তারা কভু হারা,
> ঐ ঝরা ফুলে নেয় যে জনম তরুণ তরুর চারা।
> তারা হয় না কভু হারা ॥
> হারালে মোর (ও) প্রিয় যারা,
> তোমার কাছে আছে তারা;
> আমার কাছে নাই তাহারা,
> হারায়নি কো তবু ॥[৩১]

গীতার এগারো থেকে ত্রিশ পর্যন্ত শ্লোকে আত্মীয় গুরুজনের নিধন আশঙ্কায় মোহগ্রস্ত অর্জুনকে জীবাত্মার অমরতা ও অবিনাশিতার কথা বলা হয়েছে। অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে শ্রীকৃষ্ণ বলেন– "যাদের জন্য শোক করার কোনো কারণ নেই, তুমি তাদের জন্য শোক করছো, অথচ কথাগুলো বলছো পণ্ডিতের ন্যায়। কিন্তু যারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তারা জীবিত বা প্রয়াত কারো জন্যই শোক করেন না।"[৩২] অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীরা জানেন জড়দেহ আজ না হয় কাল তিরোহিত হবেই, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর; তার কোনো বিনাশ নাই। ভারতীয় বৈশেষিক দার্শনিকগণও এ প্রসঙ্গে মনে করেন আত্মা নিত্য, এর কোনো বিনাশ নাই। জীবের যখন দেহাবসান ঘটে আত্মা তখন অন্যদেহ ধারণ করে।[৩৩] বৈশেষিক দার্শনিকদের ন্যায় মীমাংসা দার্শনিকদের চিন্তাতেও রয়েছে আত্মার অনিত্য ও অবিনাশীরূপের কথা। এ মতে দেহ, ইন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধি বিনাশপ্রাপ্ত, কিন্তু আত্মা বিনাশরহিত। দেহাবসানের সাথে আত্মার বিনাশ না হওয়ায় স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় মানুষ বৈদিক যাগযজ্ঞ পালন করে। আর আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী জৈন দার্শনিকগণ মনে করেন আত্মা জন্ম ও মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। *গীতা* ও ভারতীয় দার্শনিকদের মতের প্রতিফলন রয়েছে নজরুলের মধ্যে। তিনি বলেন–

> প্রাচ্যের ঋষিরা মৃত্যুকে কখনও জীবনের শেষ বলে মনে মানেননি, বড় করে দেখেননি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মীয়েরা পরমাত্মীয় হন, প্রিয়জন প্রিয়তর হন। জীবনে যে থাকে চোখের সামনে. মরণে সেই-ই পায় অন্তরের অন্তরতম লোকে অক্ষয় আসন, মৃত্যু জীবনের পরম পরিণতির একটা ধাপ মাত্র। মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে আমরা অগ্রসর হই অমৃতলোকের পানে, ভগবানের সান্নিধ্যে। তবু মৃতজনের জন্য আমরা কাঁদি আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলে।[৩৪]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে নির্দেশিত উপদেশের হুবহু মত রয়েছে নজরুলের দর্শনে। নজরুলের মতে, মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি হলেও তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেননা মৃত্যু আত্মা স্থানান্তরের একটি মাধ্যম মাত্র। মৃত্যু একটি পর্যায় থেকে অন্য একটি পর্যায়ে নিয়ে যায়; নশ্বর থেকে অবিনশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। মৃত্যু মৃতের বর্তমান আত্মীয়-স্বজনদের থেকে কেড়ে নিয়ে পূর্ববর্তী আত্মীয়দের কাছে নিয়ে যায়। ইহলোক থেকে পরলোকে স্থানান্তর করে। তিনি মনে করেন যদি মানুষ জানতে পারতো মৃত্যুর পর মৃতের আত্মা তার পূর্ববর্তীতের সাথে সাক্ষাৎ করে তাহলে তার জন্য দুঃখ করতো না বরং আনন্দ প্রকাশ করতো। যেহেতু আত্মা অমর ও অবিনাশী সেহেতু তা যে লোকেই হোক অবস্থান করে। নজরুল মনে করেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

মৃত্যুর যিনি মৃত্যু, আমি শরণ নিয়াছি তাঁর।
নাই নাই মোর চিত্তে, ওরে মৃত্যুর ভয় আর ॥
... ...
মৃত্যুরে আজ মনে হয় যেন ঘুমাই মায়ের কোলে,
হাসিয়া জাগিব পুনরায় নব জীবনে, প্রভাত হলে।
মৃত্যুর ভয় গিয়াছে যখন
মৃত্যু অমনি মরেছে তখন
আজ মৃত্যু আসিলে ধরিও জড়ায়ে, করি গলার হার ॥[৩৫]

নজরুলের মত হলো মানুষের আত্মা অমর, তাকে কখনও হত্যা করা যায় না। ভারতীয় দর্শনের বাইরে আত্মার অমরত্ব বিষয়ক নজরুলের এই চিন্তার প্রথম ইঙ্গিত লক্ষ করা যায় প্রাচীন পাশ্চাত্য দার্শনিক সক্রেটিসের চিন্তায়। প্লেটো তাঁর *Phaedo* গ্রন্থে আত্মার অমরতার সপক্ষে অবস্থান করতে প্রথমেই যে প্রশ্ন করেন সেটি হলো 'মানুষের মৃত্যুতে কি তার আত্মা অস্তিত্বশীল থাকে?' মৃত্যু পূর্বমুহূর্তে সক্রেটিসের "তোমরা দুঃখ করো না। মনে রেখো মৃত্যু কেবল আমার দেহটাকেই বিনাশ করবে, আত্মাকে নয়" উক্তির মধ্যেই রয়েছে আত্মার অমরতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। পবিত্র আল কুরআনেও বলা হয়েছে- "যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না।"[৩৬] ইসলামের এই বিধান শুধু শহীদের ক্ষেত্রে নয় বরং মৃত্যুর পর সকল মানুষকেই জীবিত করা হবে। হাশরের দিন তাদের কর্মফল প্রদান করা হবে। পুণ্যাত্মারা জান্নাতে এবং পাপী আত্মারা জাহান্নামে চিরস্থায়ীরূপে অবস্থান করতে থাকবে। গীতাতে বলা হয়েছে জরা, পীড়া বা অন্য কোনো কারণে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে অকেজো হয়ে গেলে আত্মার পক্ষে তখন সেই দেহে থাকা সম্ভব হয় না। এ কারণেই আত্মা দেহত্যাগ করে অন্য দেহে প্রবেশ করে। আত্মজ্ঞান লাভে ব্যর্থ মানুষই কেবল এই অবস্থাকে মৃত্যু বলে মনে করে।[৩৭] মৃত্যুকে জীবনের শেষ পর্যায় ধরেই ব্রিটিশেরা মনে করেছিলো ভারতীয়দের মধ্যে যারাই বিরোধিতা করবে তাদেরকে অবদমন বা হত্যা করলে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হবে। কিন্তু নজরুলের মতে জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষ অধিক শক্তিশালী হতে পারে। নজরুল মনে করেন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার রূহ বা আত্মা উপরে অবস্থান করেন। মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা অমর ও সচেতন থাকে। ফলে তার জন্য যদি কেউ প্রার্থনা করে তাহলে সে তা শুনতে পায়। নজরুল বলেন– "জমিরউদ্দীন যে দান বাংলায় রেখে গিয়েছেন, তার দাম বাংলার অনেকেই জানে না। আজ আমরা যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাচ্ছি, এতে তাঁর রূহ উপর থেকে তৃপ্তি লাভ করছে।"[৩৮] প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক গাযালিও মনে করেন

মানুষ বাস্তবতার উভয় জগতেই বাস করে; সে ইহজগতের পাশাপাশি আত্মার জগতেও বাস করে, কারণ স্রষ্টা ঐশীরূপ মানুষের মাঝে প্রোথিত করে দিয়েছেন।[৩৯]

নজরুল যে আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করতেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর পুরো সাহিত্যে। তিনি হামদ ও নাতের মাধ্যমে বারবার পরকালে নবির শাফায়াত, আল্লাহর দর্শন, পরকালে মুক্তি, আল্লাহর ক্ষমা প্রভৃতির জন্য খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমনকি মরণের পর মুয়াজ্জিনের আজান, মুসল্লিদের কুরআন তেলোয়াত প্রভৃতি শোনার মনোবাসনা থেকে "মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই" গানটি লিখেন। তিনি বিশ্বাস করতেন দেহের বিনাশ হলেও আত্মার কোনো বিনাশ নেই; আত্মা অমর।

মানবাত্মা, পরমাত্মার অংশ কি না ?

হিন্দুধর্মে আত্মা অমর, অজড়, অবিনাশী হওয়ায় আত্মাকে যেমন কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ধ্বংস করতে পারে না, তেমনি আত্মাকে পরমাত্মা থেকেও বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৪০] জীবাত্মা বলতে ব্যক্তি-আত্মাকে এবং পরমাত্মা বলতে ঈশ্বরকে বোঝায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এমনভাবে একত্রযুক্ত যে কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারে না। উভয় উভয়ের সখা; যারা এক দেহবৃক্ষকে আলিঙ্গন করে আছে। কিন্তু যখন ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বর থেকে আলাদা ভেবে 'আমি কর্তা' ভাব শুরু করে তখনই সে পরম প্রভুর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়।[৪১] *ছান্দোগ্য উপনিষদে* মানুষের আত্মাকে পরমাত্মার অংশবিশেষ এবং পরমাত্মার মতোই অক্ষয় ও অবিনশ্বর হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– "ওটি বাস্তবসত্তা। ওটি আত্মা। এবং সেটিই তুমি।"[৪২] *মুণ্ডক্য উপনিষদে* জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে এক করে দেখানো হয়েছে। মানবাত্মা পরমাত্মার সান্নিধ্যে থাকে। মানবাত্মা জাগতিক কর্মে লিপ্ত হলেও পরমাত্মা কর্মে লিপ্ত হয় না; অবলোকন করে মাত্র। *মহাভারতে* আত্মাকে পরমাত্মার অংশ বা প্রকাশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। পরমাত্মা আদিহীন, মধ্যহীন, অন্তহীন। তিনি অজ, নিত্য, তাবৎ দুঃখের অতীত। তিনি পরম ব্রহ্ম এবং পরম আশ্রয়। এই পরমাত্মাকে লাভ করার মাধ্যমেই জীবাত্মা যাবতীয় শোক-দুঃখ-ব্যাধি এবং মৃত্যুর করালগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে প্রতিটি জীবে অবস্থান করে।[৪৩]

হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় দর্শনে মানবাত্মাকে যে পরমাত্মার অংশ হিসেবে বলা হয়েছে তা নজরুলের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। নজরুল মানবাত্মাকে মহান আত্মার তথা পরমাত্মার অংশ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন পরমাত্মা প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিরাজ করেন বিধায় সকল মানুষ সমান। এখানে আশরাফ-আতরাফ, উঁচু-নিচু বলে

কোনো ভেদ নাই। সবার আত্মাই ভাস্বর। ফলে মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করার অধিকার নাই। আর মানবের অপমান মানেই হলো সে মহা-আত্মা তথা ঈশ্বরের অপমান। "উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন" প্রবন্ধে নজরুল সমাজে বিদ্যমান তথাকথিত ছোটলোক ও ভদ্র সম্প্রদায়ের কল্পিত পার্থক্যের অবসান ঘটানোর কথা বলেন। তিনি বলেন–

> ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা তো আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর একই মহাত্মার অংশ। ...এই আত্মার অপমানে যে সেই অনাদি অনন্ত মহাত্মারই অপমান করা হয়।[৪৪]

নজরুল মনে করেন জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্মার কাজও জীবাত্মার উপর বর্তায়। ঈশ্বর জগতে অশুভ শক্তিকে দমন করে শুভকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মানুষকেও তিনি সে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা মানুষের অন্যতম একটি দায়িত্ব। নজরুল মনে করেন তিনি সেই কাজই আজীবন করে চলছেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত সকল প্রকার অপশক্তির দমনকারী, সকল অন্যায়, অসাম্যের বিপরীতে সাম্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে মনে করেন। তাই তাঁর 'এক হাতে রয়েছে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর অন্য হাতে রয়েছে রণ-তুর্য'। তিনি শান্তির বাঁশি বাজান কিন্তু যে অশান্তি বাঁধায় তাকে দমন করার জন্য তিনি তলোয়ার ব্যবহার করেন। উদ্দেশ্য সৃষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন।

হিন্দুধর্ম ও দর্শনে জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ মনে করলেও ইসলাম আত্মাকে আল্লাহের অংশবিশেষ মনে করে না। পবিত্র কুরআনে কোনো কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে তাঁকে (আল্লাহ) কেউ জন্ম দেয়নি এবং তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। এই বিশ্বের সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। সুতরাং ইসলাম অনুযায়ী জীবাত্মাকে স্রষ্টার অংশ হিসেবে ভাবার কোনো সুযোগ নেই। তবে সুফিদর্শনে জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ ভাবার প্রবণতা রয়েছে। সুফিগণ মানুষকে দেখেছেন স্রষ্টার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। যোগদর্শনের ন্যায় তাঁরাও মনে করেন, মানুষ আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ তার দৃষ্টি অজ্ঞতা ও অমঙ্গল দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। অজ্ঞতার আবরণ ভেদ করে মানুষ যখনই প্রবেশ করে জ্ঞানের আলোকে, তখনই স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যকার সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যায়। তখনই সসীম মানুষ নিজেকে ঐশী সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শনাক্ত করতে পারে।[৪৫] যেমন মনসুর হাল্লাজ নিজেকে চিনতে পেরে বলেছিলেন 'আনাল হক' বা আমিই সত্য। অর্থাৎ আমার আর আমার প্রভুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নজরুলের রক্তে সুফিবাদী প্রভাব থাকায় তিনিও মনসুর হাল্লাজের মতো নিজেকে

কল্পনা করতে পারেন। আধ্যাত্মিকতার চরম পর্যায়ে তিনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর জগতের সর্বত্র বিরাজমান। সুতরাং ঈশ্বর তাঁর মধ্যেও বিরাজমান। যার প্রমাণ পাওয়া যায় নজরুলের গানের বই *জুলফিকার* এ। তিনি বলেন–

তুই খোদকে যদি চিনতে পারিস
চিনবি খোদাকে।

তোর রুহানি আয়নাতে দেখ রে
সেই নূরি রওশন ॥[৪৬]

নজরুল মনে করেন ঈশ্বর 'পরম নিত্য'। কিন্তু পরম নিত্য হলেও তিনি অনিত্য রূপ ধারণ করে ভাঙাগড়ার খেলায় মত্ত আছেন। মানুষও তাঁর সাথে এই খেলার অংশীদার। নজরুল ঈশ্বরের সাথে খেলা ও হাসি-কান্নার মাঝে নিজেকে 'পরম তুমি'র সাথে 'পরম আমি'র একাত্ম করে ফেলেন, আবার কোনো সময় তিনি তাঁকে প্রভু মেনে তাঁর পেছনে ছুটেন। নজরুল বলেন–

আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে 'পরম-আমি'রে শত বন্ধনে বাঁধি।
মোরে 'আমি' ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি,
কভু দেখি–আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।[৪৭]

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে– "পরমাত্মা সকল বস্তুতে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছেন। তিনি সকলের অগোচরে আছেন। যারা সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, তারাই কেবল তীক্ষ্ণ একাগ্র বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।"[৪৮] 'আত্মাতে পরমাত্মার উপলব্ধি' উপনিষদের মূলতত্ত্ব বা সূত্র। এ জন্য উপনিষদিক ভাবনার একান্ত বরপুত্র খ্যাত রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ক্ষুদ্রাত্মা তার অন্তরতম চেতনায় মিলিত হয় বিশ্বমানব ও পরমাত্মার সাথে। পরমাত্মার সাথে মানবাত্মা মিলতে চায়; মিলনেই তার আনন্দ। মানুষ যেন পরমাত্মার খেলার পুতুল। তিনি যেভাবে চালান মানবাত্মা সেভাবে চলে।[৪৯] বিশ্বাত্মার সাথে মিলনই মানবাত্মার মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে ইবনে সিনা পাখির রূপকের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, মানবাত্মা খাঁচায় বন্দি এক অসুখী আত্মা। দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বাত্মার সাথে মিলনই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। দার্শনিক আল-কিন্দির মতে মানবাত্মা বিশ্বাত্মা থেকে সৃষ্ট। আর আত্মার বা রুহের নির্দেশ মেনে চলাই দেহের একমাত্র দায়িত্ব। আর আল্লামা ইকবাল মনে করেন আল্লাহ পরম ও পরিপূর্ণ অহংস্বরূপ। একমাত্র আল্লাহই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। এই ব্যক্তিত্ব অর্জনই সব সসীম অহমের লক্ষ্য। 'ঈশ্বর'

ও 'মানুষ' কবিতায় নজরুল মানবাত্মা যে পরমাত্মার মধ্যে অবস্থান করে তা দেখিয়েছেন। আর 'সত্য-মন্ত্র' কবিতায় মানবের প্রাণ-বেদিতে তথা আত্মায় ঈশ্বরের অবস্থান বলে মনে করেন। তিনি বলেন–

বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন
প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাই তো প্রাণ।[৫০]

ঈশ্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকেই ঈশ্বরকে দেখেছেন পরমাত্মা হিসেবে। তবে নজরুল মনে করেন ঈশ্বর তার কাছে পরমাত্মার চেয়েও আপনতর তথা পরমাত্মীয়। তাকে যে ভয় করে তার কাছে তিনি রুদ্র; আর যে তাকে ভালবাসে তার নিকট তিনি প্রেমময় ও মধুর লীলা-কিশোর। নজরুল বলেন–

পরমাত্মা নহ তুমি, তুমি পরমাত্মীয় মোর।
হে বিপুল বিরাট, মোর কাছে তুমি প্রিয়তম চিত-চোর ॥[৫১]

নজরুল মনে করেন মানবাত্মা পরমাত্মার সৃষ্টি হলেও এদের মধ্যকার সম্পর্ক খুবই মধুর। মানবাত্মা যেমন পরমাত্মার সাথে মিলতে চায়, তেমনি পরমাত্মাও মানবাত্মাকে সেবিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সাজে আগমন করেন। 'শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র' কবিতাতে নজরুল দেখান, ঈশ্বর মানুষকে সেবিতে কখনও অত্যন্ত দীনবেশে সবারে অন্ন বিলায়; কখনও কৃষক সেজে হাল বয়, শ্রমিক হয়ে হীরক মানিক আহরণের জন্য মাটি খুঁড়ে; কখনও মুটে-কুলি সেজে সকলের বোঝা বয়, রাজমিস্ত্রি সেজে ইমারত নির্মাণ করে; মেথর-হাড়ি-ডোম হয়ে পৃথিবীর ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে; আবার কখনও বা দ্বাররক্ষক হয়ে দ্বার রক্ষা করছে। কখনও মা হয়ে কোলে তোলে, পিতা হয়ে বুকে ধরে।

নজরুল মনে করেন পরমাত্মা পরম সুন্দর। তিনি মানবাত্মার প্রতিটি পদক্ষেপে সাহস যোগান, বান্দার সুখ-দুঃখে পাশে অবস্থান করেন। 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে তিনি দেখান যে, এই 'সুন্দর' বিভিন্ন রূপে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কখনও আনন্দ-সুন্দর, কখনও বেদনা-সুন্দর, আবার কখনও বা ধ্যান-সুন্দর হয়ে আগমন করেছেন । ঈশ্বর প্রথমে তাঁর নিকট আগমন করেছেন ছোট গল্প হয়ে, তারপর পর্যায়ক্রমে কবিতা, গান, সুর, ছন্দ, ভাব, উপন্যাস, নাটক হয়ে। তিনি 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী', এবং 'নবযুগে' এসেছেন 'শক্তি-সুন্দর' হিসেবে। নজরুল মনে করেন রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর উদ্দেশে 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করেছিলেন তখন ঈশ্বর তাঁর নিকট ধরা দিয়েছিলেন 'আশির্বাদ-সুন্দর' হয়ে। বাঙালিদের আমন্ত্রণে যখন তিনি সারা বাংলাদেশ চষে বেড়িয়েছেন তখন ঈশ্বর বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য 'প্রকাশ-সুন্দর' হয়ে

আগমন করেছেন। যৌবনে ঈশ্বর তাঁর নিকট আগমন করেছেন 'যৌবন-সুন্দর' এবং 'প্রেম-সুন্দর' হিসেবে। শিশুপুত্র বুলবুল যখন মারা যায় তখন ঈশ্বর এসেছিলেন 'শোক-সুন্দর' হিসেবে। পুত্রের বেদনায় যখন তিনি কাতর হয়ে পুত্রকে আর একবার দেখার জন্য ধ্যান করতে লাগলেন তখন তিনি ঈশ্বরকে দেখতে পান 'ধ্যান-সুন্দর' হিসেবে। এছাড়াও তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন 'প্রলয়-সুন্দর', 'ধরিত্রী-সুন্দর' রূপে। এভাবে সুন্দররূপ পরমা শ্রী তথা আত্মাকে নজরুল সর্বাস্তিত্বে সর্বক্ষণ অনুভব করেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর ও ব্যক্তিমানুষ একই সত্তা। একে অপরের মধ্যে বিলীন।

জীবাত্মা, পরমাত্মার অংশ কি না এ প্রশ্নে নজরুলের মধ্যে সুফিবাদী দর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। নজরুল জীবনের প্রারম্ভিক সময়ে সুফিবাদী পরিবেশে বড় হওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে সুফিবাদী দর্শনের প্রভাব পড়েছিল। পরবর্তীতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে সুফিবাদী চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে আরো দৃঢ়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সুফিবাদী দর্শনে স্রষ্টার সাথে স্থিতি (বাকা) তথা একাকার হওয়ার কথা বলে। নজরুলও আবেগের আতিশয্যে স্রষ্টাকে আত্মার আত্মীয় হিসেবে মনে করেছেন, এবং সেই চিন্তা থেকেই তিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ হিসেবে মনে করেছেন। ব্যক্তিমানুষকে বিলীন করে দিয়েছেন ঈশ্বরের সাথে। সুতরাং বলা যায়, সত্তাগত দিক থেকে নয়; বরং, সুফিবাদী প্রেমের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ তথা অভিন্ন হিসেবে মনে করেছেন।

মরণোত্তর জীবন প্রসঙ্গ

মানব ইতিহাসে আত্মার পুনর্জন্মের ধারণা অতি প্রাচীন। এমনকি বলা হয় যে মানুষের নির্দিষ্ট ধর্মমতের উদ্ভবের পূর্বে পুনর্জন্মের ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। মৃত্যুর পর বিভিন্ন জাতি-উপজাতি তাদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী মৃতদেহকে সৎকার করতো এমনকি মৃতদেহে পুনরায় আত্মার প্রবেশ করতে পারে এই ধারণা থেকে মৃতের জন্য খাদ্য ও বাহন রেখে আসার রীতিও প্রচলিত ছিলো। এই ধারা সভ্যতার এই লগ্নে এসেও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন সেন্ট্রাল অস্ট্রেলিয়ার নাঞ্জি উপজাতি আজো কোনো ধর্মমত গড়ে তুলতে পারেনি। ঈশ্বরের ধারণাও তাদের মধ্যে নেই কিন্তু তারা এক ধরনের পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে।[৫২]

হিন্দুধর্মে মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হলো মোক্ষলাভ করা। মোক্ষলাভের মূলে আছে একটি দার্শনিক মত জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ। কর্মবাদ অনুসারে যেমন কর্ম তেমন ফল। এই জীবনের কৃতকর্মের ফল ভোগ করা সম্ভব না হলে স্থূল দেহ বিনাশের পর সূক্ষ্ম দেহ অভুক্তকর্ম বহন করে এবং কর্মফল ভোগ উপযোগী নতুনদেহ গ্রহণ করে। পুনর্জন্ম অর্থ

হলো জীবের মৃত্যুর পর আত্মার পুনরায় অন্য সদ্যপ্রসূত দেহ পরিগ্রহণ। পুনর্জন্মের কর্মফল ভোগের জন্য জীবের জন্ম। গীতায় বলা হয়েছে-"হে কৌন্তেয়, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক থেকেই মানুষ ফিরে পুনঃজন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু আমাকে পেলে আর পুনঃজন্ম হয় না।"[৫৩]

সেমেটিক ধর্মসমূহে বিশেষত ইসলামের সকল ক্রিয়াকর্মই পরিচালিত হয় পরকালীন জীবনকে কেন্দ্র করে। পরকালীন জীবনে মুক্তিলাভ তথা পরম প্রভুর সান্নিধ্য পাওয়াই মুসলমানদের চরম লক্ষ্য। এ জন্য স্রষ্টা মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষের এই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ভালো-মন্দ দুই ধরনের কাজই করতে পারে। মৃত্যুর পর পরকালে হাশরের দিন তথা বিচার দিবসে সকলকে তাদের কর্ম অনুযায়ী কর্মফল প্রদান করা হবে। যারা প্রভুর নির্দেশিত ভালো কাজ করবে তারা মুক্তি পেয়ে জান্নাতে পরম প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করবে। আর যারা ভুল পথে চলেছে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

মরণোত্তর পরবর্তী এই জীবন নিয়ে বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছে সন্দেহ। তারা আধিবিদ্যক বিষয়কে যুক্তি দ্বারা প্রমাণযোগ্য নয় বলে এর অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। ১৯২৮ সালে কতিপয় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মিলে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় মিলিত হয়ে 'ভিয়েনা সার্কেল' গঠন করেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো আধিবিদ্যক বিষয়গুলোকে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অযৌক্তিক প্রমাণ করা। পরকালীন জীবন অভিজ্ঞতা নির্ভর না হওয়ায় তার অস্তিত্বকে তাঁরা অস্বীকার করেন। অবশ্য তাঁদের পূর্ববর্তী ইমানুয়েল কান্ট যুক্তির আলোকে ঈশ্বর ও অমরত্ব প্রমাণ করতে না পেরে অবশেষে ব্যবহারিক বুদ্ধি ও নীতিবোধের মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে যেহেতু ইহলোকে মানুষের কর্মফল যথার্থভাবে দেওয়া সম্ভব হয় না, সুতরাং পরলোক আছে। নজরুলও বিজ্ঞানের যুক্তির দিকে যেতে চান না। কূটতর্কের পরিবর্তে কান্টের ন্যায় পরলোকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। নজরুলের উক্তির মধ্যে রয়েছে তার প্রমাণ। ভিয়েনা সার্কেল যে বছর প্রতিষ্ঠিত হয় সে বছরই বন্ধু মোতাহার হোসেন চৌধুরীকে লেখা পত্রে নজরুল বলেন– 'তুমি হয়তো পরজন্ম মানো না, তুমি সত্যান্বেষী গণিতজ্ঞ। কিন্তু আমি মানি–আমি কবি।"[৫৪] নজরুল ভিয়েনা সার্কেল সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে তাঁর এই উক্তি ভিয়েনা সার্কেলের দর্শনবিরোধী তা স্পষ্ট। এটি থেকে স্পষ্ট যে, তিনি বস্তুবাদবিরোধী ছিলেন।

কান্ট যে দৃষ্টিতে আত্মার অমরতাকে স্বীকার করেছেন ঠিক একই দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে নজরুলের চিন্তায়। জীবনের রূঢ় বাস্তবতায় তাঁর সারাটা জীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কেটেছে। দারিদ্র্য, বৈবাহিক জীবনের অশান্তি, মনের মানুষ কর্তৃক অবহেলা, সন্তানের মৃত্যু, স্ত্রীর অসুস্থতার পাশাপাশি নিজের অসুস্থতা, হিন্দু-মুসলিম ধর্মান্ধ কর্তৃক সমালোচনা

প্রভৃতি নজরুলের জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। তিনি শান্তি খুঁজেছেন, কিন্তু কোথাও পাননি। নজরুলের প্রত্যাশা ইহলোকের এই দুঃসহ জীবন যেন পরকালেও না থাকে। এজন্য তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা করেন। তিনি খোদার নিকট সুখের মিলন ও আলিঙ্গন চান। নজরুলের ভাষায়-

সারাজীবন কাটলো আমার বিরহে, বঁধু,
পিপাসিত কণ্ঠে এসে দিও মিলন-মধু।
তুমি যেথায় থাকো প্রিয়, সেথায় যেন যাই (খোদা),
সখা বলে ডেকো আমায়, দীদার যেন পাই (খোদা);
সারা জনম দুঃখ পেলাম, (যেন) এবার সুখে মাতি ॥[৫৫]

"পরজনমে দেখা হবে প্রিয়/ ভুলিও মোরে ভুলিও", "রোজ হাশরে আল্লাহ্ আমায় করো না বিচার।/বিচার চাহি না, তোমার দয়া চাহে এ গুনাহগার", "আখেরে পার হবি যদি পুল-সেরাতের পোল" প্রভৃতি গানের মধ্যে ইসলামের পুনরুত্থান দিবসের প্রতি আস্থার দিকটি রয়েছে। অন্যদিকে "হাঁ, যদি পারো আশীর্বাদ করো, যেন এবার জন্ম নিলে তুমি যাকে ভালবাসো, সে-ই হয়ে জন্মগ্রহণ করি!", "সে মরণ-বরণ করে তার কালো রূপস্রষ্টার কাছে চলে গেল ! এবার বুঝি সে অনন্ত রূপের ডালি নিয়ে আরেক পথে আমার অপেক্ষায় বসে থাকবে!" প্রভৃতি উক্তির মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় পুনর্জন্মের প্রতি বিশ্বাসের ইঙ্গিত রয়েছে। ফলে বলা যায় নজরুল হিন্দু-মুসলিম উভয়ই ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক হওয়ায় তাঁর মধ্যে পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থানের যৌথ চিন্তা প্রভাব বিস্তার করেছিলো। পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থানের সূক্ষ্ম পার্থক্যকে হয়তো তিনি আলাদা করে দেখেননি। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মুক্তি বা মোক্ষলাভকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পুনরুত্থান বা পুনর্জন্ম তাঁর মুখ্য ব্যাপার ছিল না। স্রষ্টার সান্নিধ্যই তিনি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতেন।

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠায় এবং বাংলার ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস করার বাসনায় অধ্যয়ন করেছিলেন প্রধান প্রধান ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহ। ফলে ধর্মসমূহের ধর্মীয় প্রত্যয়গুলোকে তিনি সব্যসাচীর মতো ব্যবহার করতে পারতেন। যার প্রতিফলন রয়েছে তাঁর আত্মা বিষয়ক ধারণায়। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কিত উপনিষদ, বেদ, গীতা এবং ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে বর্ণিত আত্মার প্রতিশব্দগুলোকে তিনি যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন। ধর্মীয় চিন্তার পাশাপাশি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের আত্মা সম্পর্কিত চিন্তারও এক আশ্চর্যজনক

প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। প্রাচীন ভারতীয় আস্তিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক চিন্তা, মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তা, এবং পাশ্চাত্য আস্তিক্যবাদী সক্রেটিস থেকে শুরু করে এ যুগের ডেকার্ট, কান্ট, রুশো প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তার প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে কারণ, তিনি তাঁর মধ্যকার অসীমতাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তিনি নিজের আত্মাকে চিনতে পেরেছিলেন।

আত্মার স্বরূপ আলোচনায় নজরুলের চিন্তার মধ্যে জড়বাদী দার্শনিকদের মতবাদের বিরোধিতা লক্ষণীয়। জড়বাদী দার্শনিকেরা আত্মাকে জড়ের উপজাত হিসেবে মনে করেন। তারা দেখান যে আত্মা জড়ধর্মী হওয়ায় দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মারও মৃত্যু ঘটে। ফলে পরকালীন জীবন বলতে কিছু নেই। জড়বাদী দার্শনিকদের প্রতিক্রিয়ায় ভাববাদী দার্শনিকদের সাথে একমত পোষণ করে নজরুল দেখান যে, আত্মা অক্ষয়, অমর, অব্যয়, অজড় ও অবিনাশী। দেহ বিনাশের সাথে আত্মার বিনাশ হয় না, বরং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। মোক্ষলাভ-ই এর একমাত্র লক্ষ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. এম. মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৬০।

২. গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার*, ২য় মুদ্রণ, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৬৫।

৩. তদেব, পৃ. ১৬০।

৪. H.G. Narahari, *Atman in Pre-upanisadic Literature,* Ganesh and Co., Madras, 1944, p. 43.

৫. আজিজুন্নহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ*, সংবেদ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৩০।

৬. এম. মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২।

৭. Md. Akhtar Ali, "The Concept of the Soul in Judaism and Islam" *Philosophy and Progress*, Vols. XXXI-XXXII, Dev Center for Philosophical Studies, June-December 2012, p. 74.

৮. আল কুরআন, ১৭:৮৫।

৯. *ঐ*, ১৫:২৯।

১০. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১২৬।

১১. গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল জীবনী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১২৮।

১২. কাজী নজরুল ইসলাম, "অভয়-মন্ত্র", 'বিষের বাঁশি', অন্তর্গত *নজরুল-রচনাবলী*, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১ম খণ্ড বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১২০। অতঃপর খণ্ডসংখ্যাসহ নর লিখিত হবে।

১৩. তদেব, পৃ. ১২১।

১৪. "আমার পথ", 'রুদ্র-মঙ্গল', নর ২য়, পৃ. ৪২০।

১৫. তদেব, পৃ. ৪২১।

১৬. "রাজবন্দীর জবানবন্দী", নর ১ম, পৃ. ৪৩৪।

১৭. "মধুরম্", 'অভিভাষণ', নর ৮ম, পৃ. ৪৪।

১৮. "আমার সুন্দর", 'প্রবন্ধ', নর ৭ম, পৃ. ৩৮।

১৯. "মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা", 'দুর্দিনের যাত্রী', নর ২য়, পৃ. ৪০৭।

২০. "নিশান-বর্দার", 'প্রবন্ধ,' নর ৭ম, পৃ. ১৬।

২১. নজরুল ইসলাম, "উইলিয়ম জেমস ও জাঁ পল সার্ত্রের মানবতাবাদের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের মানবতাবাদ", পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৩৯।

২২. "আত্মশক্তি", 'বিষের বাঁশী', নর ১ম, পৃ. ১২২।

২৩. এম. মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১

২৪. গীতা: ২:২০। দ্রষ্টব্য: আজিজুন্নহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

২৫. গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩-৪।

২৬. "পত্রাবলী", নর ৯ম, পৃ. ২৬৪।

২৭. "মৃত্যুহীন রবীন্দ্র", 'বিবিধ', নর ১১তম, পৃ. ২৭১।

২৮. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, চতুর্থ সং, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪১-২।

২৯. তদেব, পৃ. ২১৬।

৩০. "মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা", 'অভিভাষণ', নর ৮ম, পৃ. ২০।

৩১. "অগ্রন্থিত গান", নর ১০ম, পৃ. ৩৫৪।

৩২. এম. মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০।

৩৩. তদেব, ১৬৩-৪।

৩৪. "পত্রাবলী", নর ৯ম, পৃ. ২৫৬।

৩৫. "অগ্রন্থিত গান", নর ১০ম, পৃ. ৩৬১।

৩৬. আল কুরআন, ২:১৫৪।

৩৭. এম. মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

৩৮. "অভিভাষণ", নর ৮ম, পৃ. ৩২।

৩৯. ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *স্রষ্টার ইতিবৃত্ত: ইহুদি, ক্রিশ্চান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের স্রষ্টা সন্ধানের ৪,০০০ বছরের ইতিহাস*, অনু. শওকত হোসেন, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৫২।

৪০. এম. মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩।

৪১. আজিজুন্নহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

৪২. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১:৪।

৪৩. এম. মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮-৯।

৪৪. "উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন", 'যুগবাণী', নর ১ম, পৃ. ৩৯৬।

৪৫. আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*, ১ম সং, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩০৪।

৪৬. "জুলফিকার", নর ৪র্থ, পৃ. ৩০০।

৪৭. "অভেদম্", 'নতুন চাঁদ', নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ১৯।

৪৮. কঠ উপনিষদ: ১।৩।১২।

৪৯. মোঃ আনিসুজ্জামান, "রবীন্দ্রনাথের সর্বেশ্বরবাদ", *দর্শন ও প্রগতি*, বর্ষ-৩৩, ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১৬, পৃ. ৭৩।

৫০. "সত্য-মন্ত্র", 'বিষের বাঁশী', নর ১ম, পৃ. ১৩৮।

৫১. "অগ্রন্থিত গান", নর ১০ম, পৃ. ৩৬০।

৫২. আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*, *পৃ.* ৩২৭-৮।

৫৩. গীতা, ৮:১৬।

৫৪. "পত্রাবলী", নর ৯ম, পৃ. ২২৩।

৫৫. "অগ্রন্থিত গান", নর ১১তম, পৃ. ৬।